ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 876-882
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.301

বৈদিক সংস্কৃতি ও নৈতিকতা: একটি দর্শনগত পর্যালোচনা

অরিন্দম গাঙ্গুলী, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstract

The importance of ethics and values in human society is immense. Man is a social being, and the origin and development of ethics and values are due to the need for that sociality. In India, ancient and complete traditional patterns of ethics and values can be seen in the thinking of society. There are signs of it since the dawn of Indian history, but its prevalence can be seen from Vedic society. The traditional patterns of ethics that can be seen in Vedic culture are observed in the present Indian society. The main source of information for understanding Vedic culture is Vedic literature. Vedic literature is mainly divided into four categories – Samhita, Brahmana, Aranyaka and Upanishads. According to recent chronology, the possible time range of Vedic literature is from 1500 BC to 600 BC, almost a thousand years. The central idea in the ethics of Rigveda is the concept of ritual 'Rta'. The main idea of which is a unique thought that unites discipline and morality. Along with this, the concept of religion, karma, is prevalent. Which speaks of the complete development of the individual and society. The concept of *Purushaartha* has taken place as the main goal of individual life. In the social field, the sense of world brotherhood, community thinking has taken place. In educational thought, attention has been paid to the development of character and personality rather than the improvement of worldly life. The central thought of the Upanishads is the thought of searching for truth. A prayer is mentioned in the search for knowledge of 'truth', the highest truth and complete knowledge. The thought of the relationship between nature and man has taken place, the five elements of creation and life, the five elements are mentioned. The idea of harmonious development of nature and man has been given. In the current globalized society, in the context of its decline and degradation, it has special significance in the overall development of man and society. An attempt has been made to highlight that aspect in this article.

Keywords: Vedic culture, literature, social life, morality.

ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল বৈদিক যুগ। বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তার ভথ্যসূত্র সম্পর্কে জানা বিশেষ প্রয়োজন। বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতির যে চিত্র পন্ডিত ও ঐতিহাসিকরা তুলে ধরেছেন তা মূলত সাহিত্যগত তথ্যের উপর নির্ভর করে। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের সীমাবদ্ধতাই এর একমাত্র কারণ। আকার ও বৈচিত্রে ব্যাপক এই বৈদিক সাহিত্যের সময়কাল নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

সাম্প্রতিক কালনির্দেশ অনুযায়ী বৈদিক সাহিত্য সম্ভার এর সম্ভাব্য কাল সীমা খ্রিস্টপূর্বাব্দ ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ প্রায় সহস্র বছর ব্যাপী।[১]

বৈদিক সাহিত্য:

বেদ শব্দের মানে হল পবিত্র ও পরম জ্ঞান। ইন্দো-ইউরোপীয় তথা পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন সাহিত্য হল বেদ। তবে এটি একটি শুধুমাত্র বিশেষ গ্রন্থ নয়, আকার ও বৈচিত্র্যে ব্যাপক এই সাহিত্য প্রায় শতাধিক সমষ্টি। বৈদিক সাহিত্য কে মূলত চারটি অংশে বিভক্ত করা হয়- ১) সংহিতা ২) ব্রাহ্মণ ৩) আরণ্যক ৪) উপনিষদ। এই ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় বৈদিক সাহিত্যের অনেক গ্রন্থ আজ বিলুপ্ত। তবে আজও যা বেঁচে আছে তা সুবিশাল। এখানে তার প্রাথমিক ধারণা উল্লেখ করা যাক। সংহিতা: সংহিতা মূলত চারটি ক) ঋগ্বেদ সংহিতা, খ) সামবেদ সংহিতা, গ) যজুর্বেদ সংহিতা, ঘ) অথর্ববেদ সংহিতা।

ক) ঋগ্বেদ সংহিতা: আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ঋক শব্দের অর্থ হল 'song of praise'। ঋগ্বেদ মানে 'The Veda of the knowledge of the songs of the praise'। ঋকবেদ এর পাঁচটি শাখার নাম পাওয়া যায়- শাকল, বাষকল, আশ্বলায়ন, সংজ্ঞায়ন এবং মণ্ডুক। শুধুমাত্র শাকল শাখাটি বর্তমান। এতে দশটি মন্ডল। ১০২৮ টি সুক্ত। ১০,৪৬২ টি স্তবক। ঋকবেদ পদ্য ছন্দে সংকলিত পৃথিবীর প্রাচীনতম সংকলন। তবে এর রচয়িতা কোন একজন ব্যক্তি নয় বা কোন একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার রচনাও নয়। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রধান বিষয়বস্তু হল দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রশস্তি- অন্ন, ধন, গবাদি পশু, সন্তান ও নিরাপত্তা কামনা।

খ) সামবেদ সংহিতা: তিনটি শাখা বর্তমান যথা- কৌথুম, রাণায়নীয় এবং জৈমিনীয়। মোট ১৫৪৯ টি স্তবক। সংহিতা টির প্রধানত দুটি ভাগ আর্চিক ও উত্তর আর্চিক। উদ্‌গাতা প্রথমে আর্চিক ভাগের সাহায্যে সুরগুলি আত্ম করবেন- আর্চিক অংশ যেন মনে রাখবার জন্য গানের প্রথম স্তবক গুলি সংকলন বিশেষ। তার পর উত্তর আর্চিক ভাগের সাহায্যে তিনি বৈদিক স্তৌএগুলি সুর করে গাইবেন। সামবেদ সংহিতা প্রধান বিষয়বস্তু হল গান।

গ) যজুর্বেদ সংহিতা: প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত- কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ। বর্তমান পাঁচটি শাখার নাম পাওয়া যায় কৃষ্ণ যজুর্বেদ এর চারটি শাখা যথা কাঠক সংহিতা, কঠ সংহিতা, মৈত্রায়নী সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্ল যজুর্বেদের মাত্র একটি শাখা যার নাম বাজসেনীয় সংহিতা। বৈদিক সাহিত্যে যে সব যজ্ঞ এর পরিচয় পাওয়া যায় যথা অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, রাজসূয়, ইত্যাদির জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করার বিধি ছিল যজুর্বেদ সংহিতায়।

ঘ) অর্থর্ববেদ সংহিতাটি আধুনিক পণ্ডিতেরা অথর্ববেদকে যাদুমন্ত্রের বেদ আখ্যা দিয়েছেন। অথর্ব বেদে মোট ৭৩১টি সুক্ত প্রায় ৬০০০ স্তবক এবং কুড়িটি অধ্যায় আছে।

ব্রাহ্মণ: ব্রাহ্মণগুলি হল যাগ-যজ্ঞ মূলক ক্রিয়াকান্ডের এক জটিল ও বিশাল সাহিত্য। উপরের তালিকাতে এদের নামগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আরণ্যক ও উপনিষদ এগুলো তুলনামূলক পরবর্তী সময়ের রচনা। এখানেই সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট ও সচেতন দার্শনিক চিন্তা ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় যা পরবর্তী কালে ভারতীয় দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে।

বৈদিক সমাজ - সংস্কৃতি ও নৈতিকতা:

ভারত ইতিহাসের বৈদিক যুগ সময়ের ব্যবধানে প্রায় সহস্র বছর ব্যাপী বিস্তৃত। মোটামুটি পনেরশো থেকে ছয়শত খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমগ্র বৈদিক যুগকে পণ্ডিতেরা প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন যথা ঋকবেদের যুগ ও পরবর্তী বেদের যুগ। স্বভাবতই এই বিস্তৃত সময়কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ বৈদিক

যুগের সমাজ অর্থনীতি সংস্কৃতি ও ভাবধারা এক ধরণের ছিল না সময়ের সাথে তা ছিল পরিবর্তনশীল এবং এ প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। বৈদিক সমাজ ছিল মূলত কৃষি ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীল এক গ্রামকেন্দ্রিক সমাজ। গ্রাম জীবন ছিল বৈদিক সংস্কৃতি প্রধান দিক। বৈদিক সমাজ জীবন ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত যথা জন, বিশ, গণ, গ্রাম, কুল । বৃহত্তর একক ছিল জন এবং ক্ষুদ্র একক হল কুল। কুল বা পরিবার ছিল সমাজের মূল ভিত্তি। যৌথ একান্নবর্তী পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ছিল। পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে গৃহপতি বা কুলপতি বলা হত। পিতা, মাতা, পিতামহ, ভগ্নি, ভাই ও অন্যান্য পরিজন নিয়ে পরিবার গঠিত হত। পরিবারের ব্যক্তিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকত। বৈদিক আর্যগোষ্ঠীর বিশ্ববীক্ষায় দৈব হস্তক্ষেপ ছিল স্বাভাবিক ও অনিবার্য। কেননা তখন দৈনন্দিন জগতে দেবতা, দানব, পিশাচ, প্রেত, নাগ ও পশু বিরাজ জ্বরত। প্রত্নকথাগুলিতে তখন এই বিশ্বাস পরিস্ফুট হয়েছে যে, সৃষ্টিতে কোনো নীতিহীন বিশৃঙ্খলা নেই; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মে শাসিত। বিশ্বজগতের অন্তর্লীন সাম্যবোধ বিপর্যস্ত করার জন্য কিছু কিছু শক্তি সক্রিয়; বিধ্বস্ত ঐক্যবোধকে পুনর্বিন্যস্ত করার অনিবার্য আবশ্যিক প্রেরণা থেকে প্রাশুরু প্রত্নকথাগুলির জন্ম হয়েছে। সৃষ্টির মূলগত ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেবতারা মানুষের ওপর অর্পণ করেছিলেন ব'লেই মানব জীবন একটি কেন্দ্রীভূত বিশ্ববোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই আধ্যাত্মবাদী প্রণতা থেকেই এক মহৎ নীতিবোধের জন্ম হয়েছিল; তাই অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক মানসিকতাই তৎকালীন সমাজে একমাত্র স্বীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠল এবং প্রত্যেক তাৎপর্যপূর্ণ মানবিক কার্যই হয়ে উঠল ধর্মাচরণের অঙ্গ। যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রত্যেক অনুপুঙ্খ প্রত্ন-পৌরাণিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে নীতিবোধের বিচিত্রগামী অভিব্যক্তিতে নতুন একটি মাত্রা যোগ করল। ঋগ্বেদের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় সেই সমস্ত সূক্তে যেখানে দেবতা এবং মানুষকে ধৈর্য, দান, ঋজুতা, দয়া, অতিথিপরায়ণতা ও সহযোগিতা জাতীয় গুণাবলীর জন্য প্রশংসা করা হয়েছে। অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র কিংবা অশ্বীদের মতো দেবতারা পূর্বোক্ত গুণগুলির জন্যই মহৎ; বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে জীবনকে সার্থকভাবে সমন্বিত করার প্রেরণা তাঁরা দিয়েছেন; সেই সঙ্গে বিপদ, ক্ষুধা, ব্যাধি, অন্ধকার ও মৃত্যুর কবল থেকে জীবনকে মুক্ত করার যথার্থ পথও তাঁরা নির্দেশ করেছেন। বিশেষত আলোর জন্য নিরন্তর তৃষ্ণা ঋগ্বেদে বারেবারে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা বৈদিক আর্যদের নিকট এই আলো একই সঙ্গে জ্ঞান, উপলব্ধি, আনন্দ ও জীবনের প্রতীক। ঋগ্বেদের বিখ্যাত প্রার্থনা-'উদয় সূর্যকে যেন আমরা চিরদিন দেখতে পাই'। ঋগ্বেদের নীতিবোধের মূল প্রেরণাই এই যে, জীবন অমূল্য এবং মূলত কল্যাণময়, মধুর ও উপভোগ্য ব'লেই এই আশ্চর্য রহস্যময় জীবনকে যতদিন পর্যন্ত সম্ভব, উপভোগ করাই বাঞ্ছনীয়।

বৈদিক সাহিত্যে যৌথ জীবন ও সমষ্টি চিন্তাভাবনার ইঙ্গিত স্পষ্ট যা নৈতিক দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বৈদিক সাহিত্য থেকে এ ধরনের কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল।

> "তোমরা একত্র মিলিত হও, এক কণ্ঠে ঘোষণা কর, একত্র মত বিনিময় কর; যে রূপ অতীতের দেবতাগণ সচেতনভাবে একত্র বসিয়া তাহাদের ভাগ গ্রহণ করিতেন।"[২]

'মন্ত্র সমান হউক, সমিতি সমান হউক, মন সমান হউক, বিচার এক রূপ হউক। তোমাদের সহিত একই মন্ত্রে আমি মন্ত্রনা করি, তোমাদের সহিত একই হবি দ্বারা আমি হোম করি।' অন্য একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে,

> "তোমাদের প্রচেষ্টা সমান হউক, হৃদয় গুলি এক হউক, মন এক হউক- যাহাতে তোমাদের ঐক্য স্থাপিত হয়।।"[৩]

ঋকবেদে সমষ্টি কামনা উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে দু-একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- 'হে ব্রাহ্মণস্পতি তুমি ইহার নিয়ামক। তুমি সুপ্ত কে জান এবং তনয় দান কর; দেবতারা যাহাদিগকে রক্ষা করেন

তাহারা সমস্তই মঙ্গলময়। আমরা বীর পুত্র সমূহের জন্য এই সভায় তোমায় বিশেষ করিয়া বলিতেছি।' একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে,

> "হে ব্রাহ্মণস্পতি তুমি আমাদিগের উপদ্রবকারী শত্রুকে হিংসা কর, তাহারা যেন কদাপি আমাদের প্রাপ্ত না হয়; হে ব্রাহ্মণস্পতি তুমি আমাদের রক্ষা করো।"[৪]

এছাড়াও বলা হয়েছে যে,

> "হে দ্যাবা- পৃথিবী, তোমরা দুইজন দেবতাদিগের আনন্দদায়ক অন্ন লাভ করিবার জন্য আমাদের দিকে অন্ন ও ধন সমূহ জয় করিয়া দাও।।"[৫]

পণ্ডিতেরা উল্লেখ করেছেন প্রাচীন বৈদিক সমাজে মানুষের যে চিন্তা চেতনা প্রতিফলন দেখা যায় তা ছিল পার্থিব সম্পদের কামনা। এই কামনা একান্তই পার্থিব অন্নের কামনা পশুর কামনা ধনের কামনা বল বীর্যের কামনা সন্তানের কামনা নিরাপত্তা কামনা। আধুনিক অর্থে পরিণত আধ্যাত্বিক চিন্তা ভাবনা বিকাশ দেখা যায় না যে ব্রহ্ম চিন্তা বা মোক্ষলাভ আধ্যাত্বিক চিন্তার মূল তার উল্লেখ নেই।[৬] ঋকবেদে দেবতার স্তুতির পেছনে রয়েছে প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করবার বাসনা বা পার্থিব সম্পদের কামনা। প্রকৃতির সুন্দর ও বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে প্রাচীন বৈদিক মানুষের হৃদয় যে ভাবের জন্ম হতো তা থেকেই তাদের মধ্যে নানা দেবতার কল্পনা গড়ে উঠেছিল। দৈনন্দিন জীবনে বৈদিক মানুষেরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে যেমন সূর্য অগ্নি পৃথিবী জল বাতাস উপাসনা করত।[৭] বৈদিক দেবতাদের মানবীয় রূপ এর চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে - হে ইন্দ্র তুমি যুদ্ধের নেতা তুমি নরগণের সহিত প্রধান প্রধান যুদ্ধে শত্রু সংহারে সমর্থ। ইন্দ্রের মানব নেতৃত্বে উল্লেখ রয়েছে।[৮] ঋকবেদে এও উল্লেখ রয়েছে যে, মানবের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ মানব তার আবাস গৃহ মানুষের মতোই এমনকি তিনি মানুষের মতই কথা বলতে আমাদের নিকট আসেন এবং আমাদের ধন দান করেন। বৈদিক যজ্ঞে রয়েছে জাদু বিশ্বাসের প্রভাব যা প্রাক আধ্যাত্মবাদী চেতনার প্রতিফলন তার মূল উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনা এবং যত অস্ফুট ও অচেতন ভাবেই হোক না কেন তার অন্তর্নিহিত বিশ্বাস প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম জাদুর ক্ষেত্রে ঈশ্বরের পরিকল্পনা নেই প্রকৃতির উপকৃত শক্তিশালী দেবতাদের কোন কর্তৃত্ব স্বীকৃত নয়, স্বীকৃত নয় লোকোত্তর পরিকল্পনা।[৯] বৈদিক সংস্কৃতির নৈতিক চিন্তাভাবনায় কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান করছে 'ঋত' সংক্রান্ত ধারণা। ঋকবেদের প্রাচীন পর্যায় প্রকৃত দার্শনিক চেতনার কোন আভাস যদি সত্যিই স্বীকৃত হয় তাহলে তার মূল সূত্র এই 'ঋত'-র মধ্যে সন্ধান করতে হবে। ভিনটারনিতস এর মতে- ঋত মানে 'order of the universe' বিশ্বের নিয়মানুবর্তিতা। ম্যাকডোনাল্ড কিথ এর মতে- 'ঋত' মানে বিশ্বের নিয়মানুবর্তিতা এবং নৈতিক নিয়মানুবর্তিতা উভয়ই। সুতরাং ঋত মূলে কোন এক অমোঘ নিয়মে চেতনায় অনুমিত হয় এবং সে নিয়ম সর্বব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়ম যজ্ঞের নিয়ম মানবীয় সম্পর্কের নিয়ম তথা নৈতিক জীবনের নিয়ম। ঋত-র প্রভাবে বৈদিক মানুষেরা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল তার দু একটা বিষয় বলা যেতে পারে। ঋত-র প্রভাবেই প্রভাতে ঊষার উদয় ঋত অনুসারেই পিতৃগণ আকাশে সূর্যকে স্থাপন করেছিলেন। সূর্যের জ্যোতি ঋত-র মুখ আর গ্রহণের অন্ধকার ব্রত বা নিয়মের বিপরীত। সংবৎসর ঋত-র দ্বাদশ অল যুক্ত রথ চক্র। শ্বেত অপাক গাভীর গাঢ় রক্তিমাভ দুধের মূলেও ঋত পরিচালিত গাভীর ঋত। অরণি ঘর্ষণের ফলে জল ও ঔষধি অন্তর্গত গুপ্ত যে আগুন মানুষের জন্য উন্মথিত হয় তাও ঋত-র শিখা। নদীর স্রোত ঋত-র নিয়ম অনুসারে।[১০] ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাভাবনা যে আধ্যাত্মবাদ বিকাশ লাভ করেছিল তার সূচনা বৈদিক সংস্কৃতি থেকেই বিশেষ করে উপনিষদ গুলিতে আধ্যাত্মবাদ চিন্তাভাবনা পরিণত রূপ গ্রহণ করেছিল। উপনিষদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তার নৈতিক আদর্শের স্বাতন্ত্র্য। এই সর্ব ব্রহ্মবাদী একাত্মবোধ হতেই উপনিষদের নৈতিক আদর্শের জন্য। মানুষের জীবনের একটি মূল সমস্যা হল স্বার্থ ও পরার্থে দ্বন্দ্ব। উপনিষদ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে এর সমাধান

খুঁজেছে। উপনিষদ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্ধন চেয়েছে এবং হৃদয়বৃত্তির প্রচারের ভিত্তিতে স্বার্থ ও পরার্থে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ স্নেহ প্রীতি এবং ভালোবাসার বিস্তারে এই পথেই মানুষের স্বার্থ পরিশোধিত হতে পারে।[১১] ইশ উপনিষদ বলে মানুষ ভোগ করুক কিন্তু এমন সংযমের সহিত করুক যাতে অন্যের স্বার্থের হানি না হয়, তার কারণ অন্যের স্বার্থের হানি নিজের স্বার্থের হানির শামিল হবে আমাদের সকলকে পরিব্যপ্ত করে তা একই সত্তা বিরাজমান। উপদেশ দেওয়া হয়েছে সবকিছুই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত তাই তাকে সহিত ভোগ করা উচিত।[১২] উপনিষদে যে নৈতিক মূল্যবোধ প্রচারিত হয়েছে তা মোটামুটি ভাবে বিশ্বাস বা ক্রিয়াকর্মের চেয়ে জ্ঞান ও উপলব্ধির পথেই মুক্তির.. কথা বেশি বলা হয়েছে। যে নৈতিক মূল্যবোধের কথা তাদের ভিতর দেখতে পায় তা একান্ত বাস্তবসম্মত ভালো-মন্দ সব আপেক্ষিক তাদের ব্যবধান ঘুচে যায় সব ব্রহ্মের পটভূমিতে।"[১৩] ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে ধর্মপথে তিনটি শাখা ত্যাগ অধ্যায়ন ও দানশীলতা এদের প্রথম দ্বিতীয় হল কঠোর আত্মসংযম এবং গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালন। তৃতীয় এইসব পথ অবলম্বন করে না পুণ্যবানদের জগতে প্রবেশ করতে পারে কেবলমাত্র ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতার মাধ্যমে। এ বিষয়ে খুব উচ্চমানের নৈতিকতার প্রতিফলন দেখা যায় জবালার পুত্র সত্যকাম এর গুরু দীক্ষা কাহিনীটির মধ্যে।[১৪]

বৈদিক যুগের শেষে অর্থাৎ প্রান্তীয় বৈদিক যুগে বেদকে কেন্দ্র করেই আর-একধরনের শিক্ষাব্যবস্থা জন্মলাভ করে, যা ইতিহাসে প্রান্তীয় বৈদিক শিক্ষা' বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা নামে পরিচিত। মূলত এই শিক্ষা-ব্যবস্থা হল আদি বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নত রূপ। এই যুগের শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। গুরুগৃহে বসবাসকালে গুরুর সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষার্থীরা আত্মসংযম ও আত্মশৃঙ্খলার দীক্ষায় দীক্ষিত হত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য যুগে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথা প্রকট হয়ে ওঠায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের শিক্ষার অধিকার থাকলেও শূদ্ররা শিক্ষার অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তাই বলা হয় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা, আদি বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো গণতান্ত্রিক ছিল না। এই শিক্ষা ক্রমে অগণতান্ত্রিক হয়ে পড়ে। এই যুগে শিক্ষায় বাস্তব জগতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় 'জীবনের জন্যও শিক্ষা, শুধু মুক্তি লাভের জন্য শিক্ষা নয়'।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার পাঠ্যক্রম ছিল পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার সমন্বয়। ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা, আর যাবতীয় বিজ্ঞান, শিল্প, কলা ইত্যাদি অপরাবিদ্যা। উপনিষদের ঋষি বলেছেন, 'অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্জা বিদ্যয়াহমৃতমতে' অবিদ্যা অর্থাৎ কলা, বিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যার অনুশীলন জগতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। অন্যদিকে ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যার প্রয়োজন অমৃতত্ব বা চরম শান্তি লাভের জন্য। শুধুমাত্র লৌকিক বিদ্যা বা কেবলমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যা নিয়ে চললে মানুষের কল্যাণ হয় না। উপনিষদে বলা হয়েছে- 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাং উপাসতে তত ভূয় এব তে উ বিদ্যায়াং রতাঃ।' অর্থাৎ, যারা কেবলমাত্র বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি লৌকিক বিদ্যার অনুশীলন করে, তারা একসঙ্গে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। কিন্তু যারা কেবল ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করে, তারা তার চেয়েও অধিকতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

এই যুগে পাঠ্যক্রম ছিল বর্ণভিত্তিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেননা বিভিন্ন বর্ণের জন্য বৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম এই সময় প্রচলিত ছিল। এই সময় ব্রাহ্মণরাই কেবলমাত্র বেদ পাঠের অধিকারী ছিল। অন্যদিকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের বেদ পাঠের কোনো অধিকার ছিল না।

১. ব্রাহ্মণদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম: ব্রাহ্মণদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম ছিল অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। ব্রাহ্মণদের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে যে সমস্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেগুলি হল- বেদ, সাহিত্য, দর্শন, শ্রুতি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ইত্যাদি। এ ছাড়া তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, সর্পবিদ্যা, অসুরবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (রাষ্ট্রনীতি), নক্ষত্রবিদ্যা, দেবতাবিদ্যা (নাচ, গান, বাজনা, প্রলেপ তৈরি) ইত্যাদি বিষয়গুলিও

শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন করতে হত। তা ছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য ও অধ্যাপনার জন্য ব্রাহ্মণদের সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদ ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশদভাবে অধ্যয়ন করতে হত।

২. ক্ষত্রিয়দের শিক্ষার পাঠ্যক্রম: এই যুগে ক্ষত্রিয়দের বেদ পাঠের কোনো অধিকার ছিল না। তাই তাদের পাঠ্যক্রমে বেদপাঠের কোনো স্থানও ছিল না। ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজই ছিল রাজকার্য পরিচালনা করা। এই জন্য তাদের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, দণ্ডনীতি, পঞ্চতন্ত্র । বৈদিক সংস্কৃতির মানুষজন নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। শিক্ষাকে জ্ঞান এর আলো বলে গণ্য করতেন, যেখানে জীবনের সমস্ত দিকের সার্বিক বিকাশ হবে। বৈদিক সমাজে শিক্ষা ছিল এমন যেখানে মানুষের পার্থিব চাহিদা পূরণেই শেষ কথা নয় পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করা ও নৈতিক রীতিনীতির বিকাশ ঘটানো।[১৫] বৈদিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রথমত- চরিত্রের বিকাশ, দ্বিতীয়ত-ব্যক্তিত্বের বিকাশ, তৃতীয়ত- সমাজ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো। এ প্রসঙ্গে D. R. Altekar মত-

> "The objectives of education in Vedic period where worship of God, a feeling for religion fulfilment of public and civic duties, an increase in social efficiency, protection and propagation of national culture."[১৬]

এ বিষয়ে পন্ডিত R. K. Mukherjee মনে করেন-

> "Inculcation of civic and social duties, promotion of social efficiency and the preservation and spread of national culture were the chief aims of ancient Indian education."[১৭]

বৈদিক সমাজেও পরিবেশ সচেতনতা পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে পরিবেশ প্রকৃতি সংক্রান্ত নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৮] ঋকবেদের দশম মন্ডল এর নবম সুক্ত জলের উদ্দেশ্য উৎসর্গ করা হয়েছে। ঋকবেদের একটি সুক্ততে উল্লেখ রয়েছে যে-

> "The sky is like father the earth like mother and the space their son. The universe consistent of the three is like a family and any kind of damage done to anyone of the three throws the universe out of balance."[১৯]

ঋকবেদের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে যে-

> "Thousands and hundreds of years if you want to enjoy the fruit and happiness of live then take up systematic planting of trees".[২০]

প্রকৃতি ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে যজুর্বেদ-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে-

> "No person suit kill animal It helpful to all."[২১]

অথর্ববেদের পৃথিবী সুক্ত-তে বলা হয়েছে, *Mata Bumih putroham Prithivyah* অর্থাৎ earth is my mother, I am her son. যা প্রকৃতি সুরক্ষার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।[২২]

বিশ্বের দার্শনিক চিন্তাভাবনা সংক্রান্ত যে নৈতিকতার প্রতিফলন পাওয়া যায় ভারতীয় সমাজে তার পরিপূর্ণ সূত্রপাত বৈদিক যুগ থেকে। বৈদিক সমাজের যে নৈতিকতার প্রতিফলন দেখা যায় তা মূলভারতীয় সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নীতি নৈতিকতার এই ভাবনা বৈদিক পরবর্তী ভারতীয় সমাজকে যথেষ্ট ভাবে প্রভাবিত করেছে যা আজও তার নিদর্শন দেখা যায়। বৈদিক সংস্কৃতির নৈতিক চিন্তাভাবনা সমাজের সর্ব স্তরে বিস্তার করেছিল। এই নৈতিকতা পার্থিব ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে সমাজকে বিকশিত করেছে যা সমাজ ও ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে

সম্পৃক্ত। বর্তমান বিশ্বায়িত পরিবেশে যেখানে নীতি নৈতিকতার চূড়ান্ত অবক্ষয়, সমাজ ও ব্যক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) চক্রবর্তী, রণবীর, ভারত ইতিহাসের আদি পর্ব, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৮৬।

২) ঋকবেদ, ২০। ১৯১।।

৩) ঋকবেদ, ২০। ১৯৩।।

৪) ঋকবেদ, ১। ১৮। ৫।।

৫) ঋকবেদ, ১। ১৮। ৩।।

৬) ঋকবেদ, ৯। ৭। ৯।।

৭) চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ভারতীয় দর্শন, এন বি এ, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা-৭৮।

৮) ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৫২।

৯) চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৯।

১০) চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৯।

১১) বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণময়, উপনিষদের দর্শন, পুনশ্চ, কলকাতা, ১৯৯৮।

১২) ঈশ উপনিষদ, পৃষ্ঠা- ৮।

১৩) ছান্দোগ্য উপনিষদ, পৃষ্ঠা- ২৩।

১৪) Basam, A.L., The wonder that was India, Rupa, Kolkata, P. 256.

১৫) Saran, P, concept of Vedic education and importance of moral education, New Delhi, India.

১৬) Dr. Altekar, Education in Ancient India, New Delhi, 1965.

১৭) Mukherjee, R. K., Hindu civilization, Longman Green and Co., London, 1976.

১৮) Renugadevi, R., Environmental Ethics in the Hindu Vedas and Puranas in India.

১৯) David Ds, Tamil temple myths, Princeton University press, New Jersey, 1989.

২০) Rig- Veda, 10.32.

২১) Yajurveda, 13.37.

২২) Atharvaveda, 8.20.